সর্বনাশের নেশা

পরিমল পাত্র

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

গল্প শুনতে সবাই ভালোবাসে। ছেলে-বুড়ো সবাই। আর সেই গল্প যদি গা-ছমছম-করা ভয়ংকর লোমহর্ষক হয় তবে তো কথাই নেই। শেষ না করে উঠতেই মন চায় না। আর এমনি আকর্ষণীয় গল্পের মধ্যে যদি বাস্তবের ছোঁয়া থাকে, জ্ঞান বা উপদেশ থাকে তাহলে রথদেখা কলাবেচা দুটোই একসঙ্গে হয় — এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো। এই জন্যেই ধর্মগুরু যিশু, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ তাদের উপদেশ বাণী শুনিয়েছেন গল্পের মাধ্যমে।

আমার ছোট্ট ছেলে শ্রীমান নীলাদ্রির মনের খোরাক মেটাতে আমার গল্প বলা শুরু হয়। আজ সে কিশোর। ইতিমধ্যে প্রায় হাজার খানেক নানা স্বাদের গল্প আমি তাকে শুনিয়েছি। তারই তিনটির লিখিত রূপ হল বর্তমানের 'সর্বনাশের নেশা'। বাংলার কিশোর- কিশোরীদের কথা ভেবে লেখা এই পুস্তিকা তাদের ভালো লাগলে প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

কলকাতা বইমেলা, ২০০৬

পরিমল পাত্র

সূচিপত্র

রক্ত তিয়াসা ১১
ডাইনির চোখে জল ২১
সর্বনাশের নেশা ৫১

রক্ত তিয়াসা

ভোলানাথ দিঘির চারপাশের বনে-জঙ্গলে ধূসর রঙের ছাপ পড়েছে। বৈশাখ মাসের প্রখর রোদের তাপে ছোটো ছোটো গাছপালা ও ঘাস শুকিয়ে কেশর ফোলানো সিংহের মতো হয়ে আছে। দিঘির পশ্চিম পাড়ে একটা বড়ো তেঁতুল গাছ সেদিনের ঝড়ে উপড়ে দিঘির মধ্যে পড়েছিল। এখন শুধু মোটা মোটা ডালপালা নিয়ে গুঁড়িটা কঙ্কালের মতো পড়ে আছে। সাঁওতাল পাড়ার লোকেরা ছোটো ছোটো ডালপালা কেটে নিয়ে গেছে জ্বালানি করবে বলে। দিন দুই আগে কারা যেন শুকনো ঘাসে আগুন জ্বেলে দিয়েছিল। পুব পাড়টা জ্বলে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। আগুনের তাপে বড়ো বড়ো গাছের নীচের দিকের পাতাগুলো শুকিয়ে গেছে।

পড়ন্ত বেলায় একলা ঘুরতে ঘুরতে সমর এখানে এসে হাজির হয়েছে। পুরোনো কালের পাথর দিয়ে তৈরি সিঁড়ির ধাপগুলো শুকনো পাতায় ভরে আছে। পাশেই একটা বকুলগাছ থেকে হাজার হাজার বকুল ফুল ঝরে পড়েছে সিঁড়ির ধাপে, আশপাশের শুকনো ঘাসে। সমর একটা সিঁড়ির ধাপের ওপর এসে বসল। মনটা যখন খারাপ হয় তখন সমর প্রায়ই এখানে এসে বসে। একলা বসে ভাবে অতীত দিনের কথা। তার বয়স অবশ্য বেশি নয়। সব ভাবনাটাই তার গল্পে শোনা। তার বাবা বেশি গল্প বলে না কিন্তু তার দাদুর মুখে গল্প শুনেছে অনেক। প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের ভোলানাথ নামে এক মন্ত্রী এই দিঘি খনন করিয়েছিলেন। এই মন্ত্রী নাকি রাজার খুব প্রিয়-পাত্র ছিল। মিরজুমলার যখন কোচবিহার আক্রমণ করে তখন রাজা প্রাণনারায়ণ মন্ত্রী ভোলানাথের সঙ্গেই ভুটানে চলে গিয়েছিল। সেই মন্ত্রীর নামানুসারে দিঘির নাম—আজও লোকে একে ভোলানাথের দিঘি বলে। দিঘির উত্তর পাড়ে একটা লাল রং-এর ইটের বাড়ি ছিল। এ বাড়িটা দুশো বছর আগের বিখ্যাত নর্তকী লালবাঈ-এর বাড়ি। সেদিন এ জায়গায়টা ছিল দেবপুরীর মতো সুন্দর সাজানো গোছানো। আজ রাজাও নেই, মন্ত্রীও নেই, নেই নর্তকী লালবাঈ। কালের কবলে পড়ে সুন্দর নগরী জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। স্থানীয় লোকেরা এর দরজা-জানালা, পাথর খুলে নিয়ে গেছে।

এক সময় এই দিঘি ছিল গভীর—জল থই থই করত। চারিদিকের পাড়ে সাজানো গাছ ছিল। কত হাঁস চরে বেড়াত। সারাদিন কত হাজার হাজার পাখি চান করত, জল খেত। মাছরাঙা ঝুপ করে জলে পড়ে মাছ মুখে নিয়ে গাছের ডালে বসত। কত বক আসত। জলের মধ্যে একপায়ে সারাদিন দাঁড়িয়ে একাগ্রতার পরিচয় দিত। সন্ধ্যাবেলা তারা ওই বুড়ো বটের ডালে জমা হত। মুসলমানদের আক্রমণের পরে রাজা চলে গেল ভুটানে, প্রজারা প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। আর চলে গেল পশুপাখির দল।

পশ্চিমপাড়ের ঘন ঝোপের মধ্যে কারা যেন কথা বলছে। সমর কান খাড়া করে রইল। ক্রমে তারা আরও কাছে এল। শুকনো ঝোপের ফাঁকে একদল লোক দেখা গেল। তাদের কারও হাতে তির-ধনুক, কারও হাতে টাঙ্গি আবার কারও হাতে কাঁচা ডালের লাঠি। দু'টো কুকুর আগে আগে পথ শুঁকে শুঁকে চলেছে। সমর চিৎকার করে ডাক দিল—এ—ই তপন, শিকারে বেরিয়েছিস। দলের সবাই তাকাল ঘাটের সিঁড়ির দিকে। সমর তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। একজন সাড়া দিল—হে—ই সমর নাকি? কী করিস ওখেনে?

সমর ওদের দলে মিশে গেল। একটা বড়ো বনবেড়াল ওরা মেরে লাঠিতে ঝুলিয়ে কাঁধে নিয়ে আসছে। তাদের একজনকে সমর বলল—কোথায় ছিল এটা?

যাকে প্রশ্নটা করল সে তপন। একসময় তপন তার সঙ্গে স্কুলে যেত। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়ে ও পড়া ছেড়ে দিল। ওরা সাঁওতাল, তাই পড়াশোনা ওদের ভালো লাগবে কেন? তির-ধনুক হাতে নিয়ে শিকারে যাওয়া যে কী মজার তা যারা নয় গেছে তার বুঝবে না। সমর কখনও কখনও ওদের সঙ্গে শিকারে বের হত। এখন যেন সে ওদের চেয়ে আলাদা হয়ে গেছে, তাই ভালোভাবে আর ওদের সঙ্গে মিশতে পারে না। অথচ এই সেদিনেও তপনের দাদু মকরু সরেনের কাছে কত গল্পই শুনেছে। গল্প শুনতে শুনতে সন্ধে পার হয়ে যেত। ওর বাবা ওকে নিয়ে আসত হ্যারিকেন নিয়ে।

যখন তপন পড়াশোনা করত তখন সে যেন হাঁফিয়ে উঠেছিল। ওরা সাঁওতাল, পড়াশোনা করবে কেন? ওর বাবা-ঠাকুরদা তো কখনও বই ছোঁয়নি, তাতে কি ওদের দিন আটকে আছে। দিন তো সবারই চলে, কারও তো আটকে থাকে না, কিন্তু এই চলার মধ্যে যে কী তফাত তা তপন না বুঝলেও সমর বোঝে। বোঝে বলেইতো সেদিন অঞ্চল পঞ্চায়েত প্রধান রমেশ বসুর সঙ্গে ঝগড়াটা হল। সরকার তফশিলি জাতি উপজাতিদের বড়ো করার জন্য যত চেষ্টাই করুক না কেন সত্যিকারের উপকার তাদের হচ্ছে কই। যার বিয়ে তারই যদি ঘুম না ভাঙে পড়াপড়শি রাত জেগে কী করবে? বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। সব শিশুই মাতৃক্রোড় থেকে উঠে আসে, বড়ো হয়, জীবনে অনেক কিছুই পায়, কিন্তু মাতৃক্রোড়ের কোমলতা, নিরঙ্কুশ নির্ভরতা কি আর কোথাও মেলে! একবার যেমন বড়ো হলে আর মাতৃক্রোড়ে ফিরে আসা যায় না, তেমনি যদি লেখাপড়া শিখে সরকারের দেওয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কেউ চাকরি করতে যায় তখন আর সে ধনুক হাতে শিকার করতে যাবার মানসিকতা ফিরে পায় না। অথচ বন্য জীবন ভুলতেও পারে না। তপনই তার প্রমাণ। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে সে যেন জীবন খুঁজে পেল।

সত্যিকারের হরিজনরা না বড়ো হলেও কিছু কিছু লোক অবশ্য বড়ো হচ্ছে বইকি আইনের ফাঁক-ফোঁকর ধরে। কেষ্ট দাস নাপিতের বাচ্চা আর তার ছেলে অমল দাস কিনা পঞ্চায়েত প্রধানের কলমের জোরে মুচির বাচ্চা! সাবাস দেশের আইন-কানুন! আগের দিনে জাতে ওঠার জন্যে মানুষ কত কিছুই না করত। অনেক লোকই তো অব্রাহ্মণ হয়েও পইতে নিত। আর আজ সরকারের দয়ায় ঠিক তার উলটো। হরিজন হবার আশায় হরিজনের পোষ্য হওয়া থেকে শুরু করে হরিজন মেয়ে বিয়ে করা, বাপের নাম ভুলিয়ে দেওয়া সবই চলছে। ঠিক এই জন্যই সমরের ভালো লাগে না।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে গভর্নমেন্ট রিলিফ দিচ্ছে। অভাবী লোকেরা যারা সারা বছর কাজ পায়না—তাদের মুখে খাবার তুলে দিতে সামান্য কাজের বিনিময়ে গম ও টাকা দেওয়া হচ্ছে পঞ্চায়েতের মারফতে। সমরের বাবা অজিত মুখুজ্জ্যে ব্যাপারটা শুনে খুব আশা পেয়েছিল মনে। সমরকে বলেছিল—এখন তো গরমের ছুটি, যে কদিন রিলিফ দেয় চল্ দুজনে মাটি কাটি। তোর পরীক্ষার টাকাটা জোগাড় হয়ে যাবে।

সমর এখন উচ্চ মাধ্যমিক পড়ে। তাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়। সে জানে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হবার সময় তার বাবা অনেক মেহনত করেও ভর্তির সব টাকাটা জোগাড় করতে পারেনি। বাকি টাকার জন্যে লোকের কাছে হাত পেতে ঋণ নিতে হয়েছিল। তাই সে রাজি হয়েছিল বাবার প্রস্তাবে। তাছাড়া মাটি কাটায় তার একটা কৌতূহল ছিল। মাটির নীচে কত কিছুই না বের হয়ে পড়বে।

সমর তার দাদুর মুখে শুনেছে তাদের পূর্বপুরুষেরা বংশানুক্রমে কোচবিহারের রাজার নায়েব ছিল। পরে মুসলমান আক্রমণের পর সব ছন্নছাড়া হয়ে যায়। তাদের বিশাল সম্পত্তির অধিকাংশই হাতছাড়া হয়ে যায়। যা অবশিষ্ট ছিল তাও বিক্রি হতে হতে আজ কয়েক বিঘায় পৌঁছেছে। ভালো ফসল হলে তাদের দুঃখ থাকার কথা নয়। কিন্তু ভালো ফসল হয় কই! কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই আছে। সেবার ভরা মাঠে পঙ্গপালের দল এল। কচি ধান সব খেয়ে গেল। মাঠের পর মাঠ সাদা হয়ে গেল।

পরদিন পাড়ার সাঁওতালদের সঙ্গে অজিত মুখুজ্জ্যে ছেলেকে নিয়ে মাটি কাটতে এল। সাঁওতালদের সঙ্গে গায়ের জোরে না পারলেও মনের জোরে সমর সবার ওপরে ছিল। সমর মাটি কেটে ঝুড়ি ভর্তি করে একজনের মাথায় তুলে দেয়, কিছু পরে সে আর একজনের মাথায় তুলে দেয়। এই ভাবে চলে মাটি কাটার কাজ। শেষের লোকটি ঝুড়ি ভর্তি মাটি রাস্তার ওপর ফেলে। রাস্তা সরানোর কাজ হচ্ছে।

কামতাপুর দুর্গের চারিদিকে ঘোড়ার খুরের আকৃতির মাটির পাঁচিল। তার চারদিক ঘিরে একসময় আড়াইশো ফুট চওড়া ও পাঁচশো ফুট গভীর খাল ছিল। এখন তা পলি পড়ে বুঁজে গেছে। কোথাও কোথাও ধানের জমিতে পরিণত হয়েছে। এই খালের মাটি কেটে রাস্তা সরানো হচ্ছে।

প্রায় পাঁচশো বছর আগে খেনরাজ নীলাম্বর দিনহাটা থানায় কামতাপুরের দুর্গ নির্মাণ করে। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে দুর্গের চারিদিকে চওড়া ও উঁচু পাঁচিল দিয়ে পাঁচিলের চারিপাশে খাল কাটা হয়েছিল। পাঁচিলের বিভিন্ন জায়গায় কতকগুলো দুয়ার ছিল। এক এক দুয়ারের এক এক রকমের নাম। কোনোটা শিলদুয়ার, কোনোটা বাঘদুয়ার আবার কোনোটা অক্ষয় দুয়ার। আজও এসব দেখা যায়। সমরের কৌতূহল মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হয়তো পুরাকীর্তির সন্ধান মিলবে।

দুই তিনদিন কাজ করার পর অঞ্চলের চামচাদের সঙ্গে সমরের ঝগড়া হয়ে গেল। এর ফলে তার কাজ বন্ধ হয়ে গেল। সেদিন কাজের শেষে দাম নেবার সময় মজুররা নামের

লিস্টে নিজের নিজের নামের পাশে টিপসই দিয়ে টাকা বুঝে নিচ্ছিল, সমর অবাক হয়ে দেখল যত লোক কাজ করেছে লিস্টে তার চেয়ে অনেক বেশি নাম। এমন সব নাম যারা অনেক আগেই মরে গেছে, আবার এমন সব নাম যারা এখনও দশ বছরের নীচে। সবচেয়ে আশ্চর্য হল যে, যে নামের কোনো লোকই নেই সে নামও আছে লিস্টের মধ্যে। অশিক্ষিত মজুরদের প্রত্যেককে তিন চারজনের নামের পাশে টিপসই করিয়ে নিয়ে একজনের মজুরি দেওয়া হচ্ছে। বাকি টাকা তাহলে কোথায় যাচ্ছে? কোথায় যাচ্ছে বুঝতে অসুবিধা হল না সমরের।

সমর উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। এক সময় বলল—এসব কী হচ্ছে?

একজন সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে তাচ্ছিল্যভরে বলল—দেখতেই তো পাচ্ছ। কথা না বাড়িয়ে সই করে টাকা নিয়ে কেটে পড়তো বাছা।

উত্তেজনায় অপমানে সমরের কানদুটো লাল হয়ে গেছে। সে বলল—এসব ভালো হচ্ছে না কিন্তু।

ছেলেটি বলল—এর চেয়ে ভালো হয় না সোনা। মানে মানে কেটে পড়ো।

সমর স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। চুরি করবে অথচ বুক ফুলিয়ে অপমান করবে। কী পেয়েছে ওরা, মগের মুল্লুক নাকি!

মাটি কাটার সময় সাঁওতালদের একটা মেয়ে একটা আধুলির মতো পয়সা পায়। অনেক দিন মাটির নীচে থাকার ফলে মুদ্রাটি বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মুদ্রার ওপর বাংলা হরফে কী সব লেখা ছিল। কোচবিহারের মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের সময় থেকে টাকায় পুরোনো বাংলা বা বড়ো হরফের মৈথিলি শব্দের বদলে বর্তমান বাংলার ছোটো হরফ লেখা হত। এই মুদ্রাটি সেই সময়েরই তৈরি। একটা রুপোর আধুলি। পঞ্চায়েতের চামচা কমল আর পল্টু মুদ্রাটি মেয়েটির কাছ থেকে নিয়েছিল। এর পর আরও অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। থানায় জমা দেবার নাম করে সব পঞ্চায়েতের কাছে জমা হয়। পরে ওরা থানায় জমা না দিয়ে নিজেরাই যে যা পেরেছে নিয়েছে। এই 'নারায়ণী মুদ্রা'র ব্যাপারেও সমরের মন বিষিয়ে আছে। মুদ্রাগুলি জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে কোনো মিউজিয়ামে রাখা উচিত। তা না করে ওরা নিজেরাই নিয়ে নিল। তা হলে যারা ওগুলি পেয়েছে তারাই বা নিতে পারবে না কেন?

সমর ভীষণ রেগে গিয়েছিল। সে লেখাপড়া শিখছে, তার আদর্শ আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলবে কেন? লোভ, স্বার্থপরতা এগুলিকে চিরকাল হীন চোখে দেখে এসেছে সে। লোভীকে ঘৃণা করতে শিখেছে। অন্যায়কে অন্যায়ই জেনেছে। তাই তার ভাবনা-চিন্তা ধ্যান-ধারণা স্বার্থান্বেষী পঞ্চায়েত অফিসের লোকজনের ধ্যান-ধারণা থেকে পৃথক হবে বইকি।

সমর চিৎকার করে বলে উঠল— আপনারা লোভী স্বার্থপর। সরকারি টাকা নয়ছয় করছেন। গরিব লোকের বরাদ্দ চুরি করে বড়োলোক হচ্ছেন।

বাবলা ছুটে এসে সমরের চুল ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল— চোপ শালা, বেশি ট্যা ফোঁ করলে খালে পুঁতে রেখে যাব। তোর কোনো বাবায় কিছু করতে পারবে না।

একটু দূরে কামতাপুরের দুর্গের মাটির পাঁচিলের পাশে চট বিছিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান রমেশ বসু তার দলের লোকদের নিয়ে গল্প করছিল। হইচই শুনে তার টনক নড়ল। এত বড়ো অঞ্চলের সে প্রধান। ছোটো-বড়ো ঝামেলা তো প্রায় রোজই হয়। তার দলের দামাল ছেলেরা যেখানে আছে সেখানে গণ্ডগোলের অভাব নেই। যমরাজও ভয় পায় ওদের থামাতে। এইতো সেদিন পঞ্চু মোড়লের ছাগল গণেশ মুখুজ্যের জমিতে ধান খেল। গণেশ পঞ্চুকে জানাতে গেল কথাটা। ব্যস্ তার পরে তার পোষ্যপুত্রদের দয়ায় গণেশ মার খেয়ে মাথা ফাটাল। আবার পঞ্চুকে মারতে আসার মিথ্যে অভিযোগে বাছাধনকে পুলিশে ধরল। রমেশ বসু সবই বোঝে। এসব ব্যাপারে চুপ করে না থাকলে পঞ্চায়েত প্রধান হওয়া যায় না। ভোটের সময় ওরাই তো তাকে কীভাবে যেন জিতিয়ে দিয়েছে। বেওয়ারিশ নারায়ণী মুদ্রা আর সরকারি টাকা নিয়ে ঝামেলা বাঁধবে এ আর নতুন কথা কী?

রমেশ বসু আসতে আসতেই জিজ্ঞাসা করল—কী হয়েছে গো জিতেন—ওখানে অত গোল কেন?

বাবলা তখন সমরকে ছেড়ে দিয়েছে। রাগে অপমানে সমরের মুখ লাল হয়ে গেছে। সে হঠাৎ বলে উঠল—আপনার কাজে এত গরমিল আপনি দেখেন না কেন? লোকগুলো সব চুপচাপ। ভয়ে মজুর সাঁওতালদের মুখ কালো হয়ে গেছে। কার সামনে কী বলছে! হিসাব নেবার তুমি কে বাপু। যা হচ্ছে হোক, তোমারটা তুমি বুঝে নিয়ে বাড়ি যাও। যাক্, ল্যাঠা চুকে যাক। 'গরমেন্টে'র টাকা ওরা যদি নেয় তো তোমার কী? ওরা ছিল বলেই না রিলিফ পেলে।

গম্ভীর গলায় পঞ্চায়েত প্রধান বলল—গরমিলটা দেখলে কোথায়?

তোতাপাখির মতো সমর বলে চলল—বুড়ো আঙুল, কড়ে আঙুল, ডানহাত, বাঁহাত দিয়ে টিপসই করিয়ে নিয়ে একজনের মজুরি দিচ্ছে। বাকি লোকগুলো কারা। পরেশ খুড়ো মরেছে দু'বছর হল। সে কী করে কাজ করে? অবনি মুর্মুর ছেলে বিপিন এখনও তার মার কোলে কোলে থাকে। সে কীকরে কাজ করে? গোবিন্দ কয়াল বলে কোনো লোক কী আছে আপনার অঞ্চলে? এদের নামের টাকা কোথায় যায় তার খবর রাখেন?

জিতেন বিরক্ত হয়ে বলে—আঃ! খুব হয়েছে। চুপ করো, কাজ করতে দাও।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদে সমরের গলা শুকিয়ে এসেছিল। উত্তেজনায় সে থরথর করে কাঁপছে। গলার স্বর কেমন ভাঙা ভাঙা মনে হচ্ছে। সে বলল—চুপ করতে বলেন কেন? প্রধানের কানে এসব কথা উঠছে বলে ভয় পেয়ে গেলেন!

পল্টু এতক্ষণ রাগে ফুঁসছিল। সে ভদ্রঘরের ছেলে হলেও সাঁওতালদের সঙ্গে হাঁড়িয়া খায়। গরমের দিনে তালরসের তাড়ি খায়। সেদিন নেশায় সে মশগুল হয়ে গিয়েছিল। তেড়ে এসে সমরকে এক ধাক্কা মেরে নিজেই পড়ে গেল মাটিতে। গোঁ গোঁ করে বলে উঠল—শালা—মুখ ভেঙে দেব না। আরও কিছু অশ্লীল গালিগালাজ করতে লাগল মাটিতে পড়ে।

সমর বলে চলেছে—তিন চারদিনে দশ বারোটা নারায়ণী মুদ্রা জমা পড়েছে আপনার কাছে। তার কটা থানায় জমা দিয়েছেন? কটা আছে পঞ্চায়েত অফিসে? আর কটা গোপাল স্যাকরার দোকানে বিক্রি হয়েছে তা জানেন?